প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া

লোককথা

আসামের এককালীন গোয়ালপড়িয়া (বর্তমানে ধুবরি) জেলার গৌরীপুর রাজপরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে গানের সঙ্গে শিকার ছিল প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়ার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। বেশ কিছু অসমীয়া ছবিতে প্লে-ব্যাক করা ছাড়াও বাংলা ছবিতেও গান গেয়েছেন। কাজ করেছেন ঋত্বিক কুমার ঘটকের 'বগলার বঙ্গদর্শনে'। সঙ্গীতনাটক অ্যাকাদেমি ছাড়াও পদ্মশ্রী ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিতা শ্রীমতী প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া ন'নটা বাঘ মেরেছেন চিতাসহ। গোয়ালপড়িয়া লোকসংস্কৃতিকে সাধারণ্যে পরিচিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য ভূমিকা আজ স্বীকৃত। গ্রামের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে দেশি যন্ত্রেই তিনি এই গান পরিবেশন করেন।

গান গাইতাম মনের আনন্দে। পারিবারিক সূত্রেই গোয়ালপড়িয়া লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ। তখন বয়স কম ছিল। ভালও লাগত। কিন্তু সেই বয়সে সংস্কৃতি নিয়ে কিছু ভাবা বা বলা সম্ভব ছিল না। ক্রমে বয়স হল, নানান জায়গা থেকে ডাক পড়ল। আমাকেও প্রশ্ন করা হল সংস্কৃতির বহু জটিল বিষয়আশয় ও ইতিহাস প্রসঙ্গে। তখন সত্যই চিন্তায় পড়লাম।

লোকগান এসেছে শ্রুতির ঐতিহ্যশালী পথ ধরে। অর্থাৎ কিনা যে গান লোকমুখে প্রচারিত হয়। গান গাওয়ার মধ্যেই তার প্রচারের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় এসব ক্যাসেট-রেকর্ডের বালাই নেই। শুধু মুখে মুখে, কানে কানে শত শত বছর ধরে বেঁচে আছে এই লোকসঙ্গীত। আধুনিক সময়ে, পরবর্তী কালে, তাকে সংরক্ষণ করার কারণে রেকর্ড-ক্যাসেটে ধরে রাখা হচ্ছে। শহরেও এই গানের বাজার যথেষ্ট জমে উঠেছে। পয়সা উড়ছে যেমন তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঐতিহ্যশালী লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উৎসাহ বেড়েছে। তাই এর গতিবিধিও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে কখনো লিখতে হবে ভাবিনি। আর সত্যিই কি লেখা যায়? যে গানের উৎস খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের শ্রম ও আনন্দ-প্রমোদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে হাজার হাজার বছর ধরে সেই গান তো নিজেই জীবন্ত। তার পদ-সুর ও তালের মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পীরা তাতে গায়কির অনবদ্য ভাব এবং এক্সপ্রেশন দিয়ে সেই গানে এক অত্যন্ত আন্তরিক

পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তখন এই গানই প্রশ্ন, আবার এই গানই তার উত্তর।

এরপরও একটা প্রশ্ন থাকে। লোকসঙ্গীতের চর্চা ও শিক্ষা বিষয়ে। প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বনিবনা এবং যোগাযোগের সূত্র ধরেই আদিতে লোকচর্চার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। এটা ছিল একরকম আবিষ্কারের মতো। ধর্ম এই লোকচর্চাকে আরো গভীর ও সুসংহত করে তোলে। আরো পরে যখন সাধনভজনের কারণে মানুষ নাড়া বাঁধলো, আখড়াই জীবনযাপনের অনুশীলনে মন দিল তখন শিক্ষাকে পুরোদস্তুর গুরুপণায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন হল গুরুশিষ্যের। আমরা খোঁজ পেলাম নানা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা গুরুর। খবর পেলাম নানান কঠোর সাধনার। এটা ঠিকই যে লোকসঙ্গীতকে আয়ত্ত করতে সত্যিই কঠোর সাধনার পথে যেতে হয়। এবং এই লোকশিক্ষা, লোকসঙ্গীতই বলছে, 'গুরুর গুরু মহাগুরু, তাহার গুরু কে?' আমার অভিজ্ঞতা বলে গুরু আসলে অবলম্বন মাত্র। মানুষকে তার অর্জনের জন্য শিক্ষার কারণে নানা অবলম্বন নিতে হয়। তার মানে এমনও নয় যে 'গুরুবিনা কি আর ভাজিব'।

সাক্ষাৎকারে, কথাবার্তায় এরকম নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো গুরুর দেখা পাইনি। কারুর কাছে শিখিওনি। সাধারণ মানুষের লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির চর্চার ভিতর দিয়ে, মেলামেশার মধ্যে দিয়ে যতটুকু যা পেয়েছি। আমি তাই-ই পরিবেশন করি। আমার সহযোগী বাজনদাররাও এই গ্রামেরই মানুষ। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন তাদের। তারা কেউ মাহুত ছিল, কেউ চাষাবাদ করে, কেউবা জন্মগত সূত্রেই চামড়ার বাদ্যি বা দেশি ঢোলের কারবার করে। সমাজের নিম্নবর্গের এইসব মানুষের হাতে রাজবংশীদেরও জল চলে না। এদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এককালীন দেশি গান আজ গোয়ালপাড়িয়া লোকসঙ্গীতের পরিচয় অর্জন করেছে।

ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় আমার তেমন মন ছিল না। বাবা বললেন, 'যাক, পড়াশুনো না করলেই বা ক্ষতি কি? ও আমার কাছেই থাকুক।' আমার বাবা ছিলেন গৌরীপুরের রাজবাহাদুর প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার মধ্যম পুত্র। বড় ছেলে প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া তাঁর ফিল্মের কাজে কোলকাতায়ই থাকতেন। আর বাবা চালাতেন এস্টেট। আমার বাবা প্রখ্যাত হাতি শিকারী প্রকৃতিশ বড়ুয়া তার জগৎ বিখ্যাত হাতি ধরা ক্যাম্পেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। বাবার সঙ্গেই বনে-জঙ্গলে আমি বহুদিন থেকেছি। নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করা, পাহাড়ী আর্কিড সংগ্রহ করা, বকপাখি মারা, শিকার

করা আর গান সংগ্রহ করাই ছিল আমার জীবন। সঙ্গে ছিল বাবার শিক্ষা তাও যেন সেই লোকশিক্ষার মতোই আজও স্মৃতিতে কাজ করে যায়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকার বাবা ছিলেন লালজী বা বাবা নামে খ্যাত। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যাবেলায় বাবা তাঁর হাতির মহল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তামাক খাওয়া চলছে। কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুনের ব্যবস্থা হয়েছে। সওদাগরদের সাথে হাতি কেনাবেচার কথাবার্তায় ক্রমে মশগুল হয়ে উঠতেন বাবা। আমাকে বলতেন দূরে যেখানে মাহুতেরা ক্যাম্পের থেকে দূরে আগুন জ্বালিয়ে দোতারা নিয়ে টুং টাং করছে বা বহতা ঝর্ণার পাশে বসে কেউ একটা দেশি গান ধরেছে, সেখানে গিয়ে বসতে। বলতেন, 'ওদের গান শোন, গান কর। তবেই চর্চা হবে, গান শিখতে পারবি।'

এইভাবেই অনেকটা শুরু হয়ে যায়। ওদের আবেগ, ওদের শ্রম আর প্রেম বিরহের যে গান শুনেছি তা আজও আমাকে গান গাইতে অনুপ্রাণিত করে। প্রাচীন সেই লোকসুর সেই লোকছন্দ আমাদের বুঝিয়ে দেয় মানুষের কৃষ্টি, মানুষের সংগ্রাম, তার শ্রমশক্তির কথা। এই গানই আমি নানা অভিব্যক্তিতে নানা ভাষায় শুনেছি। শুধু কাশিমর থেকে কন্যাকুমারিকাই নয়। সারা পৃথিবীতেই এই লোক গানের একটি অভিন্ন কথা আছে। সেই কথা হলো মানুষের সংগ্রাম, তার ভালোবাসার কথা, সুস্থ্য জীবনবোধের কথা। বাবা বলতেন, 'তোদের গান আমি বুঝি না। ভাল লাগে তাই শুনি। আমি বুঝি ঝর্ণার শব্দ. ঝিঁঝিঁর ডাক, ঝরা পাতার খসখস, বাঘের ডাক, হাতির ডাক। এই সবই ভাল লাগে।' পরে মনে হয়েছে, ঠিকই তো এইসব শব্দ আর ধ্বনি থেকেই তো প্রাচীন সুর, ছন্দ, মাত্রা, লয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এসব তো মহাসঙ্গীত।

ব্যক্তিগতভাবে বাবার প্রত্যক্ষ মদত থাকা সত্ত্বেও এই লোকসঙ্গীতকে জীবনযাপন ও জীবনধারণের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে যথেষ্ট লড়াই আমাকে করে আসতে হয়েছে। একজন নারী হিসাবে গৌরীপুর রাজবাড়ির প্রাচুর্য ও অনুশাসনের বিপরীতে থেটে খাওয়া মানুষের অর্থাৎ কিনা তথাকথিত ছোটলোকের গান গাইতে যথেষ্ট সামাজিক চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনধারা আমায় বেছে নিতে হয়েছিল নিজের চেষ্টায় আর অগণিত শ্রোতাসাধারণের শুভেচ্ছায়।

একটা সময় ছিল যখন আসামে এই দেশি গান গাইতে গেলে অহমের মানুষ বলত 'এটো অহমিয়া ন হয়'। আবার বাংলার মানুষ বলত 'এতো আমাদের সংস্কৃতি নয়'। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজকে যেমন অহমের মানুষ বলে তেমন বাংলাদেশের মানুষও বলে গোয়ালপাড়িয়া

লোকসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এখানে একটা কথা আছে। ভাওয়াইয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত এই দেশি গানকে কেন গোয়ালপাড়িয়া গান বলছি। আমি গবেষক নই, বিশেষজ্ঞও নই। আমি গান গাই। যে গান বহু বছর ধরে এইখানকার মানুষ উৎসবে-অনুষ্ঠানে শ্রমের আনন্দে অবসর সময়ে গেয়ে আসছে। যে গান মানুষকে লোকশিক্ষায় শিক্ষিত করে। সেই গানকে কি নামে ডাকা হবে সেটা কি খুব বড়ো কথা? বইপত্তর আমি তেমন একটা পড়িনি। তবে শুনেছি, কামতারাজ্যের মানুষ একসময় এই মিশ্রভাষায় কথা বলত। মিশ্র ভাষা বলতে মূলত গোয়ালপাড়িয়া ডাইলেকট হলেও এর সঙ্গে মিশে আছে কোচ ও রাজবংশীদের অভিব্যক্তি ভাষার ব্যবহার। যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের গান, নৌকা বাওয়ার গান, ধান কাটার গান, বিরহের গানের সাথে মাহুতের হাতিকে ধোয়াপাখলানোর গান যুক্ত হয়ে এই অঞ্চলের আবেগের সাথে—প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নানা মানুষের আন্তরিক উৎসবে ও আনন্দে এই গান, এই সুর তৈরি করেছে এখানকারই লোক ইতিহাস।

এখানে ওখানে লোকজনের প্রশ্নের শেষ নেই। এমন প্রশ্নেরও মুখোমুখি হয়েছি, 'ভাওয়াইয়া ও আপনার গোয়ালপড়িয়া লোকগীতির পার্থক্য কি?' উত্তরে আমি প্রথম বলেছি গোয়ালপাড়িয়া আমার নয়। যারা আমাকে সাহায্য করছে, এই যে যারা বাজাচ্ছে, সঙ্গত করছে এই গান ওদের। ওখানকার মানুষের। আর দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, পার্থক্য তো আছেই। ভাবের পার্থক্য। পার্থক্য ব্যঞ্জনার, পরিবেশনার। ভাষার ক্ষেত্রেও একটা ক্ষীণ পার্থক্য আছে। এই সমগ্র অঞ্চলের ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় দু-চার ফারলং অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি : এটা সম্পূর্ণতঃ ভাবের বৈসাদৃশ্য।

যে কোনো সঙ্গীতে ভাবই প্রধান অঙ্গ। কিভাবে গাইছে, কি ভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে, কিই-বা তার ভঙ্গিমা মানে এক্সপ্রেশন—তার ওপরই নির্ভর করে সঙ্গীতের গুণাগুণ—রকমফের।

এরপরও জানিয়ে রাখি। আমার খুবই ভয় হয়। জানিনা লোকসঙ্গীত নিয়ে এতো কথা বলার অধিকার আমার আছে কিনা। পাছে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি আমার ব্যাখ্যার কেতাবি ভুল দেখিয়ে নাস্তানাবুদ করে। তবু আমি সেইসব পণ্ডিত লোক বিশেষজ্ঞদের বলতে চাই এরকম টীকাটিপ্পনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে মেতে না থেকে বরং লিখুন না লোক-সঙ্গীতে কিভাবে অশিক্ষা ঢুকিয়ে, টাকা ঢুকিয়ে, বিদেশি যন্ত্র ঢুকিয়ে গ্রামের

মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আর কেনই-বা প্রকৃত লোকশিল্পী দুর্দশায়-অনাহারে তারই তৈরি করা শিল্পের সর্বনাশ দেখছে।

আমি লেখা-পড়া শিখিনি। ভাল লাগতো তাই গান গাইতাম। হয়তো পারতাম বলেই গাইতাম। কিন্তু কোনো কিছু লেখার জন্য যে সময় যে শিক্ষার প্রয়োজন হয় তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একজন সঙ্গীতজ্ঞ যুবক আমায় প্রশ্ন করেছিল আমি কোন স্কেলে গান গাই। প্রথমে আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যাই। তারপর সামলে নিয়ে আমার সহযোগীদের জিজ্ঞেস করি। যুবকটি বুঝতে পারে। আমি বলি, এই স্কেল শব্দটাই আমার শহরের শিক্ষা। আর সব অশিক্ষা, বড়োই গ্রাম্য। এই গ্রামীণ ভাবধারার অশিক্ষাই কি তবে লোকশিক্ষা? □

অনুলিখন : ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়